প্রথম আলো

কলাম

অভিমত-বিশ্লেষণ

নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা কেন জরুরি

সর্বশেষ জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হয় ২০১০ সালে। সেই শিক্ষানীতির ভালো-মন্দ দিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে এই লেখায়। একই সঙ্গে নতুন শিক্ষানীতির প্রয়োজন ও প্রস্তাব তুলে ধরা হয়েছে। লিখেছেন **তারিক মনজুর**

তারিক মনজুর

আপডেট: ০৯ মে ২০২৬, ১৮: ০১

২০১০ সালে সর্বশেষ জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের পর দেড় দশকের বেশি সময় পার হয়ে গেছে। এর মধ্যে শিক্ষাসংশ্লিষ্ট নতুন কমিশন গঠিত হয়নি, নতুন শিক্ষানীতিও তৈরি করা হয়নি। অথচ এই সময়ের মধ্যে শিক্ষাসংশ্লিষ্ট প্রয়োজন ও বাস্তবতার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে।

সর্বশেষ শিক্ষানীতির 'প্রাক্‌কথনে' শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরে বলা হয়েছে, শিক্ষা জাতীয় উন্নতির চাবিকাঠি এবং দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্য পূরণের প্রধান অবলম্বন। শিক্ষার মাধ্যমেই মেধা ও মননে আধুনিক এবং চিন্তাচেতনায় প্রাগ্রসর জাতি গঠন সম্ভব। একই সঙ্গে এই দাবিও করা হয়েছে, 'স্বাধীনতার পর ৩৯ বছর পার হয়ে গেলেও কোনো শিক্ষানীতি বাস্তবায়িত হয়নি।'

শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে বাধা কোথায়

স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে কুদরাত-এ-খুদার নেতৃত্বে দেশের প্রথম শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশন ১৯৭৪ সালে সরকারের কাছে একটি বিস্তৃত রিপোর্ট পেশ করে। এরপর ১৯৭৬ সালে জাতীয় কারিকুলাম ও সিলেবাস প্রণয়ন কমিটি ও ১৯৭৮ সালে জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়। পরবর্তী সময়ে ১৯৮৩, ১৯৮৭, ১৯৯৭, ২০০১, ২০০৩ এবং ২০০৯ সালে শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়।

এসব কমিশন নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছে কিংবা আগের শিক্ষানীতির সংস্কার করেছে। সর্বশেষ গঠিত কমিশন ২০১০ সালে যে শিক্ষানীতি উপস্থাপন করে, সেখানে বলা হয়েছে, এক সরকারের আমলের শিক্ষানীতি ক্ষমতার পটপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 'আস্তাকুঁড়ে' নিক্ষেপ করা হয়। শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের পথে এটা একটা বাধা। তা ছাড়া অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষানীতি সফল করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের অভাব দেখা গেছে।

সর্বশেষ শিক্ষানীতির ঘাটতি কোথায়

২০১০ সালের শিক্ষানীতিতে উল্লেখ করা হয়েছে, এটি কোনো দলীয় শিক্ষানীতি নয়, জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটিয়ে তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু শিক্ষানীতির প্রাক্‌কথন ও মুখবন্ধ পুরোপুরি দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা। তা ছাড়া এই শিক্ষানীতি দাবি করে, সব ধরনের বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে সবার জন্য শিক্ষার অধিকার ও সুযোগ নিশ্চিত করা এর মৌলিক ভিত্তি হবে।

আসলে সবার জন্য সুযোগ সমান করলেই বৈষম্যের অবসান ঘটবে, তা নয়। বরং অভিভাবকের আয়ের সঙ্গে সংগতি রেখে শিক্ষার্থীর স্কুল-কলেজ বা উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভর্তি ফি, বেতন ও অন্যান্য খরচ নির্ধারণ করে বৈষম্যের প্রকৃত অবসান ঘটানো সম্ভব।

আবার শিক্ষানীতিতে 'মানসম্মত', 'আধুনিক' ও 'যুগোপযোগী' শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দক্ষ মানবসম্পদে উন্নীত করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এসব শব্দের সুনির্দিষ্ট অর্থ বা ব্যাখ্যা না থাকায় সেই লক্ষ্যও নির্ধারণ করা কঠিন।

সর্বশেষ শিক্ষানীতির শক্তি কোথায়

২০১০ সালের শিক্ষানীতি শিক্ষার্থীর মান যাচাই বা শিক্ষার মূল্যায়ন পদ্ধতির মৌলিক পরিবর্তন করতে চায়। এ জন্য ক্লাসরুমের শিক্ষাকে সফল করে তোলার কথা বলা হয়েছে। নোটবই, প্রাইভেট, টিউশনি এগুলোকে ‘আপদ’ হিসেবে উল্লেখ করে এসব থেকে শিক্ষার্থীদের মুক্তি দেওয়ার সুপারিশ আছে। সার্বিক শিক্ষাজীবনকে আকর্ষণীয়, নিরাপদ ও আনন্দময় করে তোলার প্রস্তাব আছে।

এই শিক্ষাক্রমে কম্পিউটার ও আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তিতে শিক্ষার্থীদের দক্ষ করে তোলার কথা আছে। তাদের নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন ও সচ্চরিত্রের অধিকারী করে তোলার আকাঙ্ক্ষা আছে। একই সঙ্গে নতুন প্রজন্মকে মানুষ ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ করে তোলা এবং ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলার উদ্যোগ নিতে বলা হয়েছে।

২০১০ সালের শিক্ষানীতিতে কী আছে

সর্বশেষ শিক্ষানীতি ২৮টি অধ্যায়ে ভাগ করে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এরপর দ্বিতীয় থেকে পঞ্চদশ অধ্যায় পর্যন্ত সাধারণ ও বিশেষায়িত শিক্ষার লক্ষ্য ও সুপারিশ নিয়ে আলোচনা আছে। এর অন্তর্গত বিষয়: প্রাক্-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা, বয়স্ক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষা, ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা, উচ্চশিক্ষা, প্রকৌশল শিক্ষা, চিকিৎসাসেবা ও স্বাস্থ্য শিক্ষা, বিজ্ঞান শিক্ষা, তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা, ব্যবসায় শিক্ষা, কৃষি শিক্ষা এবং আইন শিক্ষা।

পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে শিক্ষা-সম্পর্কিত নীতি, লক্ষ্য ও কৌশল তুলে ধরা হয়েছে। এর মধ্যে আছে নারীশিক্ষা, কারুকলা ও সুকুমারবৃত্তি শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষা, স্কাউট গার্ল-গাইডস ও ব্রতচারী, ক্রীড়া শিক্ষা। এ ছাড়া গ্রন্থাগার, পরীক্ষা ও মূল্যায়নপদ্ধতি, শিক্ষার্থী কল্যাণ, শিক্ষার্থী ভর্তি, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, শিক্ষকের অধিকার ও দায়িত্ব, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষা প্রশাসন, শিক্ষার স্তর ইত্যাদি নিয়েও আলাদা অধ্যায় আছে।

প্রাথমিক শিক্ষার স্তর কী হবে

প্রাথমিক শিক্ষার আগে ৫ বছরের বেশি বয়সী শিশুর জন্য প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষার প্রস্তাব করা হয়েছে। বাংলাদেশে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২০১৪ সাল থেকে এক বছর মেয়াদি প্রাক্-প্রাথমিক শ্রেণি আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হয়। তবে ২০১০ সাল থেকেই সীমিত পরিসরে এটি চালু ছিল। শিক্ষানীতিতে চার বছরের বেশি বয়সী শিশুদের অন্তর্ভুক্ত করে এটিকে দুই বছর মেয়াদি করার প্রস্তাব রয়েছে।

শিক্ষানীতিতে ২০১৮ সালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ পঞ্চম শ্রেণি থেকে বাড়িয়ে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সম্প্রসারণ করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল। কিন্তু নানা বাস্তবতায় সেটি সফল করে তোলা যায়নি। বিশেষ করে শিক্ষার্থী ঝরে পড়া সমস্যার সমাধান না করা পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার স্তর বাড়ানো যৌক্তিক নয়।

শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার কারণ কী

বাংলাদেশে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার প্রধান কারণ দারিদ্র্য। শিক্ষানীতিতে দরিদ্র ছেলেমেয়েদের উপবৃত্তি সম্প্রসারণের কথা আছে। কিন্তু উপবৃত্তির আওতা বা হার সামগ্রিক দারিদ্র্যের অনুপাতে কীভাবে বাড়ানো হবে, তার কোনো লক্ষ্যমাত্রা নির্দেশ করা হয়নি। আবার পিছিয়ে পড়া এলাকাসহ গ্রামের বিদ্যালয়গুলোতে দুপুরের খাবার ব্যবস্থা পর্যায়ক্রমে চালু করার পরিকল্পনা থাকলেও কার্যকর মাত্রায় তা সফল করা সম্ভব হয়নি।

পাহাড়ি, দূরবর্তী ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের ছেলেমেয়েদের জন্য হোস্টেলের ব্যবস্থা করার প্রস্তাব করা হয়েছে। মেয়েশিশুরা স্কুলে যাতায়াতের পথে যাতে উত্ত্যক্ত না হয়, তা নিশ্চিত করার কথা আছে। এ ছাড়া শিক্ষাকে আনন্দঘন করার উদ্দেশ্যে সব ধরনের শারীরিক শাস্তি বিলুপ্ত করার সুপারিশ করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা এই, শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার কারণ জানা থাকলেও তা পুরোপুরি রোধ করা সম্ভব হচ্ছে না।

প্রতিবন্ধী ও ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর শিশুরা পিছিয়ে

প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী শিক্ষা অর্জনের চ্যালেঞ্জ এক রকম নয়। অর্থাৎ দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিশু শ্রেণিকক্ষে যে ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হয়, শ্রবণপ্রতিবন্ধী শিশুর সমস্যা সে ধরনের নয়। এ ছাড়া বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী, শারীরিক প্রতিবন্ধীসহ সব ধরনের প্রতিবন্ধী শিশুর জন্য উপযুক্ত সুযোগ তৈরি করা সম্ভব হয়নি। বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধিতার জন্য শ্রেণিতে যে ধরনের প্রশিক্ষিত শিক্ষক থাকা দরকার, বিদ্যালয়গুলোতে মারাত্মকভাবে তার ঘাটতি রয়েছে। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের শৌচাগার ও চলাফেরার সুবিধাও নিশ্চিত করা দরকার।

অন্যদিকে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর শিশুরা বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েই ভাষা সমস্যার মুখোমুখি হয়। এ ধরনের শিশুদের নিজেদের ভাষায় শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ তৈরির জন্য শিক্ষানীতি অনুযায়ী তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত পাঁচটি ভাষায় পাঠ্যপুস্তক তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর ভাষায় পাঠদানের উপযোগী শিক্ষক তৈরি করা সম্ভব না হওয়ায় এই কার্যক্রম এক অর্থে স্থবির হয়ে পড়েছে।

মাধ্যমিক স্তর যদি দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত হয়

সর্বশেষ শিক্ষানীতিতে উচ্চবিদ্যালয়গুলোতে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি সংযোজনের সুপারিশ করা হয়েছে। সে ক্ষেত্রে মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত চার বছর নির্ধারণের পরিকল্পনা আছে। কিন্তু যেসব বিদ্যালয়ে বর্তমানে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাদান করা হয়, সেগুলোর ক্ষেত্রে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক বা নবম শ্রেণি থেকে মাধ্যমিক স্তর কীভাবে করা সম্ভব, তার কোনো পদ্ধতি বা সূত্র উল্লেখ করা হয়নি।

আবার উচ্চশিক্ষার স্তরে অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল গুরুত্বপূর্ণ হবে, নাকি বর্তমান প্রক্রিয়া অনুযায়ী ভর্তি পরীক্ষা চালু থাকবে, সে ধরনের কোনো নির্দেশনা নেই। বর্তমানে মাধ্যমিক পর্যায়ে নবম শ্রেণিতে ভর্তির সময়ে শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞান, মানবিক বা ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় আলাদা হয়ে যায়। এই বিভাজন একাদশ শ্রেণিতে করার সুপারিশ বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষাবিদ ও নীতিনির্ধারকেরা বলে আসছেন, যেটি এখনো বাস্তবায়ন করা হয়নি।

উচ্চশিক্ষার কৌশল ও পদ্ধতি কী হবে

এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার সঙ্গে পেশাগত কাজের সমন্বয় আশানুরূপ পর্যায়ে পৌঁছায়নি। এ কারণে বিশেষ ক্ষেত্রে পাঠ গ্রহণ সম্পন্ন করেও শিক্ষার্থীরা যথেষ্ট দক্ষ হয়ে ওঠেন না কিংবা তাঁদের উপযোগী কাজ পান না। উদাহরণস্বরূপ, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ভাষাকেন্দ্রিক বিভাগ, যেমন বাংলা, ইংরেজি, সংস্কৃত, পালি, আরবি, ফারসি, উর্দু ইত্যাদি থেকে পাস করেও শিক্ষার্থীরা নির্ধারিত ভাষায় যথেষ্ট দক্ষতা বা যোগ্যতা অর্জন করেন না।

তা ছাড়া গত কয়েক দশকে বিসিএসসহ সরকারি চাকরির প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও চাহিদা প্রবলভাবে বেড়েছে। অন্যদিকে চাকরির বাজারে বিশেষায়িত জ্ঞান কিংবা অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমেছে। এর কারণ হলো বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সিলেবাস প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রায় ক্ষেত্রেই শিক্ষাক্রম অনুসরণ করা হয় না।

নতুন শিক্ষানীতি কেন প্রয়োজন

সর্বশেষ শিক্ষানীতি প্রায় কোনো বিষয়েই পূর্ণাঙ্গ ও স্পষ্ট ধারণা দেয় না। অনেক ক্ষেত্রে বিদ্যমান পদ্ধতিকেই কৌশল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন ‘চিকিৎসা, সেবা ও স্বাস্থ্য শিক্ষা’ শিরোনামে উপস্থাপিত ১০ম অধ্যায়ে লেখা হয়েছে, ‘মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির জন্য উচ্চমাধ্যমিক শেষে ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া অব্যাহত থাকবে। ভর্তি পরীক্ষায় কোনো প্রার্থী দুই বছরের বেশি অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে না।’

আবার কিছু ক্ষেত্রে ‘বায়বীয়’ লক্ষ্যমাত্রা নির্দেশ করা হয়েছে। যেমন নার্সিং শিক্ষা সম্পর্কে লেখা হয়েছে: ‘নার্সিং পেশার চাহিদা দেশে এবং বিদেশে রয়েছে এবং বাড়ছে। মানসম্পন্ন নার্সিং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ সম্প্রসারিত করা হবে।’ শিক্ষানীতিতে বিদ্যমান অবস্থা ও নতুন লক্ষ্য সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা না হলে তা বাস্তব ক্ষেত্রে যথাযথভাবে প্রতিপালন করা সম্ভব নয়।

নতুন শিক্ষানীতির বৈশিষ্ট্য কী হবে

নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য রাষ্ট্র ও সমাজের বিভিন্ন অংশীজনের সঙ্গে বসতে হবে। অনলাইনেও মতামত গ্রহণের সুযোগ রাখতে হবে। শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে বিদ্যমান অবস্থা-ব্যবস্থা ও সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে পর্যালোচনার দরকার হবে। সে ক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর সঙ্গে শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির আলাপ করার প্রয়োজন হবে।

নতুন শিক্ষানীতি যাতে শুধু কাগুজে লক্ষ্য-উদ্দেশ্যযুক্ত না হয়, সেদিকে গুরুত্ব দেওয়া দরকার। জাতীয় উন্নয়নের সঙ্গে একে সমন্বিত করতে হলে জাতীয় লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে এর আকাঙ্ক্ষাগুলোকে সম্পর্কযুক্ত করা দরকার। প্রতি পাঁচ বছর পরপর নির্দিষ্ট বিরতিতে শিক্ষানীতি প্রণয়ন বা সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। একটি স্থায়ী শিক্ষা কমিশনও শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও সংস্কারের জন্য সরাসরি কাজ করতে পারে।

- **তারিক মনজুর** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক

মতামত লেখকের নিজস্ব

prothomalo.com

সম্পাদক ও প্রকাশক: মতিউর রহমান

স্বত্ব © ১৯৯৮-২০২৬ প্রথম আলো